মহীয়সী জননী

চিত্তরঞ্জন মাইতি

[গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাই, প্রথিতযশা জনপ্রিয় এই প্রবীণ সাহিত্যিক গত ১ অক্টোবর ২০১৩ প্রয়াত হয়েছেন। নিবোধত-র প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। তাঁর কাছে লেখা চেয়ে আমরা কখনও বিমুখ হইনি। উপরন্তু অযাচিতভাবেই বহু লেখা তিনি পত্রিকা দপ্তরে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এখনও আমাদের সঞ্চয়ে রয়েছে তাঁর বেশ কয়েকটি অপ্রকাশিত রচনা। আমরা তাঁর আত্মার শান্তিকামনা করি।

লেখক তাঁর দীর্ঘ জীবনপরিক্রমায় যেসব ঘটনা বা চরিত্রের মুখোমুখি হয়েছেন সেগুলিরই পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে 'আমার দেশ, আমার স্বজন' শীর্ষক কাহিনিগুলিতে। সত্যের আধারে কাহিনিগুলি পরিবেশিত হলেও সাহিত্যিকের সরস উপস্থাপনাকে যথাসম্ভব অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। জীবনের শিক্ষা ও পাঠের স্বাদুতা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অশীতিপর সাহিত্যিকের মর্মস্পর্শী রচনায়।]

একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটছে তখন। দোতলার গরাদ ধরে মা সমানে চেঁচাচ্ছেন—হতভাগা চলে আয়, কালকেউটে ছোবল মারলে একেবারে শেষ হয়ে যাবি।

তাঁর বারো বছরের ছেলে তখন একটা কঞ্চি হাতে শাসন করছে উদ্যতফণা এক কালনাগিনীকে।

ভাঙা কাছারির কতকগুলো ইট পাঁজা হয়ে পড়ে আছে অনেকদিন। তার ভেতর এক কালকেউটের বাস। সে গোটা দশেক ছানা নিয়ে বসবাস করে। এক আঙুল লম্বা বাচ্চাগুলো ফণা উঁচিয়ে আছে। তাদের পাতলা চামড়ার ভিতর দিয়ে নীলরঙের বিষটা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। রোগা পটকা কালো ছেলেটার বাঁ হাতে একটা কানাউঁচু অ্যালুমিনিয়ামের কাঁসি। সেটাকে সে ঢালের মতো ব্যবহার করছে। ডান হাতে তার নাগ-শাসনের একটা হাত দেড়েক কঞ্চি। তাই মায়ের আর্তচিৎকার।

ইতিমধ্যে সে কয়েকটা বাচ্চার মাথা লাঠি দিয়ে চেপে ধরে নীল বিষ বের করেছে, কিন্তু বাচ্চাগুলোকে মারেনি। এইসব কাণ্ড দেখেই সম্ভবত পাঁজা থেকে বেরিয়ে এসেছে তাদের জননী।

নিচে এক জননী তার বাচ্চাদের রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে আর ওপরে এক জননী তাঁর দুর্দান্ত বাচ্চাটিকে বাঁচানোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছেন।

বারকয়েক সাপের ছোবল খেল ঢাল হিসেবে ব্যবহৃত হাতের কাঁসিটা। কয়েকবার লাঠির বাড়ি পড়ল সাপটার পিঠে এবং লেজে। শেষে পরাভব মেনে সাপটি বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে আবার সিঁধোল পাঁজার ভেতর। বীর বালক কিন্তু মা সাপটিকে একেবারে মারতে চায়নি। কারণ তার মনে হয়েছিল, মা মারা গেলে বাচ্চাগুলো খুব কাঁদবে।

পরে যখন ছেলে ঘরে উঠে এল তখন মায়ের হাতে চড়চাপড় খেল প্রচণ্ড। সে-দৃশ্য দেখা যায় না, একেবারে পেড়ে ফেলে বেধড়ক মার।

আশ্চর্য! খাওয়ার সময় ওই দস্যি ছেলের পাতে পড়ে সব থেকে বড় মাছটি। ছোট ভাই অবাক হয়ে তাই দেখে। একদিন নয়, দিনের পর দিন এই ঘটনা ঘটে খাওয়ার সময়।

এখন রান্নার বামুন ছাড়িয়ে দিয়েছেন নির্মলা দেবী। অবস্থা-বিপর্যয়ে নিজেই খুন্তি ধরেছেন। এই ছেলেটি মনে যতখানি সাহসী, শরীরে ততখানি দুর্বল। তাই মায়ের অগাধ স্নেহ এ-ছেলেটির ওপর।

নির্মলা দেবীর বিয়ে হয়েছিল তাঁর চোদ্দো বছর বয়সে। বিশ ক্রোশ দূরে মহকুমা শহরের সংলগ্ন একটি গ্রামে তাঁর পিত্রালয়। সেসময় পালকি আর গোরুর গাড়ি ছাড়া আর যানবাহন ছিল না। বড় নদী পেরোতে হত। তাই গোরুর গাড়িতে না এসে টানা পালকিতে যাতায়াত করতে হত। রসুলপুর নদী পেরোতে হত নৌকোয় পালকি চাপিয়ে।

একবার নদী পেরোতে গিয়ে বিপর্যয় ঘটল। ভাঁটার টানে জলের স্রোত তখন অনেক দূর সমুদ্রের দিকে সরে গেছে। নদীর চর পিচ্ছিল সাপের পিঠের মতো দেখা যাচ্ছে। নৌকো থেকে দু-একজন বেহারা প্রথমে চরে নামল, অন্যেরা পালকি তুলে নামল নিচে। আর যায় কোথায়, চোরাবালিতে মুহূর্তে ডুবে গেল তাদের পা।

এ-দৃশ্য দেখে ততক্ষণে নেমে পড়েছে বালিকা বধূ। তার পা-ও বসে যাচ্ছিল। তীরে বসেছিল পারার্থী কিছু লোক। তারা চিৎকার করতে করতে নেমে এল—কোনও ভয় নেই মা, ভয় নেই।

বলিষ্ঠ লোকগুলি চোরাবালির এলাকাটা জানত। তারা তার পাশ দিয়ে নেমে এসে নির্মলা দেবীর হাত ধরে প্রথমে তুলে নিতে গেল কিন্তু সে চেঁচিয়ে বলল—আগে ওই বেহারাগুলোকে তুলে নিন বাবা, ওরা অনেকখানি ডুবে গেছে।

সেদিন ওই চোদ্দো বছরের কিশোরী নিজের জীবনের কথা বড় করে ভাবেনি, অন্য মানুষের বিপদের কথা বেশি ভেবেছিল।

অযোধ্যাপুর গ্রামে কবিরাজ শিরোমণি উপেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা সে, পিতার পরম আদরের। প্রভাতে আট ঘটিকার ভেতরেই কবিরাজ তাঁর পালকিতে গ্রামগ্রামান্তরে রোগী দেখতে বেরিয়ে যেতেন। এত নামডাক ছিল যে, গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকে তাঁর পালকির ডাক শুনলেই বুঝতে পারত আর জমা হত তাঁকে ঘিরে।

হয়তো কোনও বটতলায় বসে তিনি নিদেন নির্ণয় করে ওষুধের পরামর্শ দিতেন।

হাটবাজারের ভেতর দিয়ে পালকি গেলে ছেঁকে ধরত হাটুরেরা। তিনি সাধ্যমতো তাদের সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতেন। যে-বাড়ির ডাকে তিনি পালকি নিয়ে বেরোতেন, সেখানে পৌঁছতে তাঁর অনেক দেরি হয়ে যেত। রোগী দেখা শেষ করে ফিরতে ফিরতেও অনেক সময় রাত হয়ে যেত তাঁর।

কাছে পিঠে কোথাও যাওয়ার সময় সঙ্গে থাকত তাঁর এই মেয়েটি।

অযোধ্যাপুরের পাশের গ্রাম 'দারুয়া'। বালির আলপথ পেরিয়ে বাঁশের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগিয়ে গেলেই সামনে বালির পাহাড়। সে-বালি ভাঙা প্রায় দুঃসাধ্য। তার ওপর দিয়ে একদল পালকি ধরে ওপরদিকে টেনে তুলত। অন্যদল নিচ থেকে ঠেলত। এইভাবে উঠতে হত পাহাড়চূড়ায়। তারপর আবার সরসর করে নেমে যেতে হত নিচের দিকে। সেখানে বালির বিশাল প্রান্তর, বনঝাউ আর কাজুবাদামের বাগান। তারই কোলে কোলে এক-একটা গ্রাম। এখন আর বালির পাহাড় নেই, কোঠাবাড়ির প্রয়োজনে সব বালি সরে গেছে।

দারুয়া ছিল এমনই একটি গ্রাম। মুসলমান জমিদার 'দেওয়ান' মশাইদের বাড়ি সেই গ্রামে। তাঁর বাড়িতে রোগী দেখতে যেতেন উপেন কবিরাজ মশাই। সঙ্গে থাকত তাঁর কিশোরী কন্যা। মুসলমান বাড়ির অন্দরে প্রবেশের অধিকার একমাত্র ছিল কবিরাজ মশাইয়ের। তিনি মুসলমান রমণীদের রোগ

পরীক্ষা করতেন এবং রোগের নিদান নির্ণয় করে ওষুধ দিতেন। ততক্ষণে তাঁর বালিকা কন্যাটি সমবয়সীদের সঙ্গে মিশে যেত আর ঘরের এদিক-ওদিক ঘুরে মুসলমানদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হত। সেই বয়সেই জানার অসীম কৌতূহল জেগে উঠত তার মনে।

সেযুগেও সংস্কারহীন ছিলেন কবিরাজ মশাই। নিজে কোথাও কিছু না খেলেও মেয়েটিকে ওই বাড়িতে খেতে বারণ করতেন না। উপেনবাবুর খাবার নিজের কৌটোতেই থাকত, সেটা ভরে দিতেন তাঁর স্ত্রী সুরবালা। দেওয়ানবাড়িতে এক পঙ্‌ক্তিতে খেতে বসত মেয়েরা সকলে। একটা লম্বা পরাতে ভাত আর তরকারি দেওয়া হত। পরাতের দু-দিকে মেয়ের দল বসে তাদের খানা খেতে আরম্ভ করত। এক জায়গা থেকে একইসঙ্গে তুলে তুলে খেত তারা। নির্মলাকে আলাদা খেতে দিলেও সে ওই পরাত থেকে একসঙ্গে তুলে খেত। কোনওদিন কোনও সংস্কার তার মনে স্থান পায়নি।

পরবর্তী জীবনে নির্মলা যখন তার চরের বাড়িতে যেত তখন বাগদি মেয়েদের সঙ্গে পাতা পেড়ে একসঙ্গে ভোজন করত। এই সংস্কারমুক্ত মন সে তার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিল।

এই মাদাখালির চরের ওপর নির্মলা দেবীর লেখা একটি উপন্যাস কলকাতার এক নামি অবাঙালি প্রকাশক প্রকাশ করেছিলেন। রচনার নামটা বদলে নাম দিয়েছিলেন 'স্বপ্নমধুর'। কিন্তু লেখক মনোজ বসু মশাই বলেছিলেন, লেখিকার দেওয়া 'মাদাখালির চর' নামই ছিল যথার্থ।

যাই হোক, দারুয়ার ময়দানের একপ্রান্তে হাট বসত সপ্তাহে দুদিন। পাশের গ্রামের লোকেরা সেখানে ভিড় জমাত কেনাকাটার জন্য। মাছের বাজারে ভিড় বেশি হত। কলাপাতা দিয়ে তৈরি হত চুমকি আকারের পাত্র। কলাবাসনা দিয়ে তৈরি হত তার হাতল। সে-পাত্রে রুপাপাতিয়া, তেলতাপড়ি, পামরা চিংড়ি প্রভৃতি মাছ নিয়ে যেত খদ্দেররা।

মহরমের মেলাও বসত। বাজনা বাজাতে বাজাতে নানা আকারের সুদৃশ্য তাজিয়া আসত ওই মেলায়। একদল আর একদলের ওপর তলোয়ার নিয়ে আক্রমণ করত। 'হায় হাসান, হায় হোসেন' রব তুলে বুক চাপড়াত একদল মানুষ।

কিশোরী মেয়েটি দাদাদের সঙ্গে হাটে গিয়ে এইসব লক্ষ করত। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে আসত নির্মলারা। তার নানারকম প্রশ্নের স্পষ্ট জবাব দিতে পারত না দাদারা।

দাদাদের সঙ্গে বেরিয়ে যেত কিশোরী সমুদ্রদর্শনে। ক্রোশখানেক দূরে সমুদ্র। বালির ঢিবি পেরিয়ে একটুখানি এগোলেই হু হু করে বয়ে আসে সমুদ্রের ঠান্ডা হাওয়া।

বড় দাদা মানুষটি ধীর স্থির। তাকে ঘিরেই ছোট বোনটির অজস্র প্রশ্ন। একটু এগোলেই কেয়ার ঝোপঝাড় আর বনঝাউ, ফণিমনসার গাছ। কেয়াঝোপকে জড়িয়ে উঠেছে একরকমের লতা।

—ওটা কী লতা রে দাদা?

—ওটাকে বলে 'ল—লাঙুলিয়া'।

—অদ্ভুত নাম তো!

দাদা বুঝিয়ে বলে, 'ল' মানে লতা আর ওই লতাগাছের মূলটা লাঙলের মতো, তাই ওর নাম এরকম। গাছটা টুকটুকে লাল রঙের কয়েকটা ফুল ফুটিয়েছে। দাদা আবার বলল, এ-অঞ্চলে ওকে কাকমারা ফুলও বলে। ওই লতানে গাছ বাজবরণ আর কেয়াঝোপকে জড়িয়ে ওঠে। প্রথমে ফুলের রং হয় মাখনের মতো, পরে হলুদ, শেষে টুকটুকে লাল হয়ে যায়।

বালির পথ হাঁটতে হাঁটতে বোনের প্রশ্নে ভাঁটা পড়ে না। এক রকমের শাক দেখা গেল, খানিকটা অঞ্চল ছেয়ে আছে।—ওগুলো কী শাক?

—গিরিয়া শাক। সমুদ্রের চরে প্রচুর জন্মায় এই শাক। গরিব, ক্ষুধার্ত মানুষগুলো এই শাক সেদ্ধ

করে খায়। আর ওই যে দূরে দেখছিস, ওগুলো 'লটাকলমি'। জোয়ার-ভাঁটা খেলে যেখানে সেখানে লতিয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে। মাটি সহজে ধুয়ে যেতে দেয় না।

কত জানার আছে তার পৃথিবীতে। একটু দূরে বাঁদিকে একটা কাজুবাদামের বাগান দেখা গেল।

দাদা বলল—দারুয়ার একদিকে বাবারও এমন একটা বাগান আছে।

দাদার থেকে জানা গেল, সমুদ্রতীরের বেলেমাটিতে চাষ হয় কাজুবাদামের। ডালপাতায় ঝাঁকড়া গাছ, ফুট দশেক উঁচু, কতকটা বটপাতার আকারে ওর পাতাগুলো। আঙুল দেড়েক লম্বা জামরুলের আকারে এক ধরনের ফল হয়, যার ভেতরটা খুব নরম। পাকলে চমৎকার লাল-হলুদ রং ধরে। সেগুলো খেতে গেলে দুদিকের খানিকটা অংশ কেটে বাদ দিয়ে জলে ফেলে দিতে হয়। কষটা ধুয়ে গেলে খেতে ভালই লাগে। আসল বাদামটি কিন্তু ওই ফল থেকে বাংলা পাঁচের আকারে কঠিন একটা আবরণের ভেতর ঝুলতে থাকে।

ওই বাদামগুলো তুলে বাদামপাতার জ্বালন দেওয়া হয়। খোসাগুলোর ভেতর থেকে তখন তেল বেরোতে থাকে। তেলের গ্যাঁজলায় বাদামগুলো ফুটতে ফুটতে গাঢ় বাদামি রঙের হয়ে যায়। সেগুলো শুকোবার পর জাঁতি দিয়ে কাটলেই খোসা থেকে আসল বাদাম বেরিয়ে আসে। খুব কম বাদামই আস্ত থাকে। কিন্তু ভাঙা বাদামগুলো চিবুলেই বোঝা যায় বাজারের সল্টেড কাজুর সঙ্গে তার তফাত কোথায়।

কাঁথি অঞ্চলের বাদাম-বরফি এককালে বহুখ্যাত ছিল। ছানা পাক করে ওই কাজুবাদামের গুঁড়ো তার ওপরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। তারপর পাক করে বরফি কাটা হয়। তার মতো স্বাদ ভূভারতে পাওয়া দুর্লভ। আজকাল একভাগ কাজুবাদামের সঙ্গে তিনভাগ চিনে বাদামের গুঁড়ো ভেজাল দেওয়া হয়। তাই ওই মিষ্টিতে আগের স্বাদ আর পাওয়া যায় না।

নির্মলা ভাবে, দাদার সঙ্গে ঘুরলে কত কিছুই না জানা যায়। এরপর তেরো পেরিয়ে তার চোদ্দোতেই এল পাত্রের সংবাদ। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। প্রায় দশ ক্রোশ দূরে নদী পেরিয়ে যেতে হয় পাত্রের বাড়ি। কোবরেজ মশাই ভাবলেন, কাছে পিঠে না হয়ে মেয়েকে দূরে রাখলে আকর্ষণ তীব্র হবে। আর বংশজ বাড়ির আদবকায়দা সে ভালভাবে রপ্ত করতে পারবে।

জমিদারবাড়ির এ প্রায় ভেঙে পড়া এক শাখা। ঠাটবাট, দাসদাসী সবই রয়েছে, কিন্তু একে একে চোখের জলে বিদায় দেওয়া হচ্ছে সকলকে।

পাঁচচুড়ো মন্দিরে নিত্যসেবা বিগ্রহের। ভোরে আর সন্ধ্যায় যথারীতি কীর্তনিয়ারা কীর্তন করে যায়। ঠাকুরমশাই ঘণ্টা নেড়ে পুজো করেন। লক্ষ্মী-জনার্দনের ভোগারতি চলে।

দোতলায় বিশাল গরাদওয়ালা জানালার ধারে বসানো হয়েছিল নববধূকে। নির্মলা দেবী প্রতিদিন সেই জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দেবদর্শন করতেন। একটু দূরেই একটি গ্রাম—নাম 'কাঞ্চননগর'। সেই গ্রামে প্রতিবছর চড়কের মেলা বসত। সে-মেলায় বাঁশের ওপর চরকির পাক খেত ভক্তেরা। শেষ দিনে ঝাঁপ হত। ওপর থেকে নিচে ঝাঁপিয়ে পড়ত ভক্তেরা। অনেক ধারালো বঁটি নিচে জড়ো করা থাকত। গা-হাত-পা কেটে যেত অনেকের, কিন্তু ভ্রূক্ষেপ ছিল না সেদিকে।

মেলায় নানারকম খেলনাপাতি পাওয়া যেত। রাতে স্বামী নববধূর কাছে কাঞ্চননগরের মেলার চমৎকার একটা বর্ণনা দিলেন। শেষে বললেন—সেখানে আমি একটি জগদ্ধাত্রীমূর্তি দেখে এসেছি। ইচ্ছা আছে ওটা কিনে এনে তোমাকে দেব।

নির্মলা কাতর গলায় বললেন—সঙ্গে সঙ্গে কিনে আনলে না কেন? ওটা অন্য কেউ যদি নিয়ে নেয়!

—আমি অনেক করে দোকানিকে বলে এসেছি। ও পুতুলটা রাখবে নিশ্চয়।

সারারাত ঘুম নেই বধূর চোখে, কেবল দেখছেন সেই জগদ্ধাত্রীর স্বপ্ন। ভোরবেলা সমস্ত কাজকর্মের ভেতরেও শান্তি নেই মনে। দিনের বেলা পুরুষদের সান্নিধ্য কিংবা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার রীতি নেই। সেই রাতের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনা। রাত্রে শুরু হল প্রতীক্ষা। বালিকা বধূ তাকিয়ে আছেন দরজার দিকে। স্বামী ঢুকতে ঢুকতে বললেন—ভয়ংকর একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে।

বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছেন বধূ।

—মূর্তিটি নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দুখণ্ড হয়ে গেছে। একদিকে সিংহ, অন্যদিকে মা জগদ্ধাত্রী। দোকানির নিজের দোষেই এটা হয়েছে। আমি সিংহটাকে নিয়ে এসেছি, তুমি এটা রাখো।

নির্মলা তখন ক্ষোভে দুঃখে ফুঁসছেন। সিংহকে স্বামীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বিছানায়, কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়লেন।

স্বামী বললেন—তোমার লক্ষ্মী-জনার্দনের প্রতি ভক্তিবিশ্বাস আছে? যদি থাকে তাহলে চোখ বন্ধ করে মন্দিরের দিকে তাকিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করো, ''মা আমার জগদ্ধাত্রী এনে দাও।''

নির্মলা চোখ বন্ধ করে স্বামীর বাক্য পালন করতে লেগে গেলেন। চোখ বেয়ে জল ঝরছে। কিছুক্ষণ পরে স্বামী বললেন—এবার চোখ খোলো।

নির্মলা দেখলেন সামনের টেবিলে সিংহের ওপর জগদ্ধাত্রী বসে রয়েছেন।

আসলে একটি লোহার লম্বা পেরেক লাগানো ছিল জগদ্ধাত্রীর মেরুদণ্ডে, আর একটি ফুটো ছিল সিংহের পিঠে। সেই ফুটো দিয়ে পেরেকটা যখন ঢুকে যেত, তখন মনে হত সিংহের ওপর জগদ্ধাত্রী বসে আছেন, একইদিকে দুটো পা ঝুলিয়ে।

এই নির্মলা দেবী আমার মা।

সেই মূর্তি এখনও আমার বাড়িতে রয়েছে। জগদ্ধাত্রীপুজোর সময় সমারোহে মায়ের পুজো হয়, আমার কন্যা এবং তার কন্যা এই মূর্তির পুজো করে থাকে। একদিকে জগজ্জননী মা সারদা, অন্যদিকে জগদ্ধাত্রীর সেই মূর্তি—প্রায় শতবর্ষ আগেকার কেনা পোর্সিলেনের তৈরি সেই বিগ্রহ। *(ক্রমশ)*

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত হল

উপনিষদের অমৃত

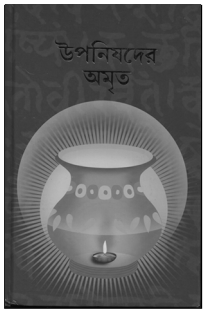

স্বামী বিবেকানন্দ বেদ-উপনিষদের শাশ্বত ভাবধারাকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন বনের বেদান্তকে ঘরে আনতে। তাঁরই চিন্তাধারার অনুবর্তনে নিবোধত পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়ের উপনিষদীয় আলোচনার সূত্রপাত। 'উপনিষদের অমৃত' নামে দশবছর ধরে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত এই মনোজ্ঞ উপনিষদচিন্তন বহুজনের অনুরোধে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল। স্বামীজীর ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে নিবোধত পত্রিকার শ্রদ্ধার্ঘ্য এই গ্রন্থটি শাস্ত্রামোদী, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জন করবে। মূল্য ১৫০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীসারদা মঠ, সারদাপীঠ, উদ্বোধন কার্যালয়, অদ্বৈত আশ্রম, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার।